The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 165-178
ISSN 2306-3920

প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় শিক্ষার প্রসার : পরিপ্রেক্ষিত বরিশাল

মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলায় কাঠামোগত শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় ব্রিটিশ শাসনামলে। তবে প্রাক-ব্রিটিশ শাসনামলেও এই অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। নদী বেষ্টিত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরিশালের সর্বত্র একইভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে বরিশালের কোন কোন অঞ্চলে শিক্ষার এমন বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল, যার দৃষ্টান্তও বিরল। পুরাতন ভাবধারার ধর্ম, সংস্কৃত চর্চা, টোল, মক্তব প্রভৃতিতে যেমন তৎকালে অবিভক্ত বাংলায় বরিশালের গৈলা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তেমনি ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণেও গৈলা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। গৈলা ছাড়াও বরিশালের বানারীপাড়ার গাভা, খলিশাকোটা, বাবুগঞ্জের দেহেরগতি, গৌরনদীর নলচিড়া, বাটাজোড়, চাঁদশী, উজিরপুর, শোলক ও ধামুরা এলাকাও শিক্ষায় বেশ অগ্রসর ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে বরিশাল তথা বাংলায় শিক্ষার প্রসার নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।]

সূত্র শব্দ : প্রাক-ব্রিটিশ, ব্রিটিশ শাসনামল, বাংলা, শিক্ষা, বরিশাল।

ভূমিকা

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে বাংলায় শিক্ষার স্তর ছিল তিনটি। যথা: প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে, গৃহে, দোকানের কোনে অথবা গাছের নিচে প্রদান করা হতো। হিন্দু শিক্ষার্থীদেরকে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হতো। কখনও কখনও মুসলমানদের মক্তব ও হিন্দুদের পাঠশালা একই ছাদের নিচে বসতো। সকালে মুন্সি (মুসলিম শিক্ষক) এবং অপরাহ্নে পন্ডিত (গুরু) ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। হিন্দু বালিকারাও পাঠশালায় অধ্যয়ন করতো। তখন বাকলা চন্দ্রদ্বীপের বহুগ্রামে বাংলা, সংস্কৃত, আয়ুর্বেদ শিক্ষার চর্চা হতো। অনেক গ্রামেই চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার ঐতিহ্যবাহী পীঠস্থান বরিশালের গৈলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম চর্চার সুযোগ থাকাতেই সে সময়ে বিজয় গুপ্তের মত কবি সৃষ্টি হয়েছিল। উপমহাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে গৈলার প্রথম যোগসাধন ঘটে ত্রিলোচন দাসের মাধ্যমে। এই অঞ্চলের শম্ভুচন্দ্র বাচসপতি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত দর্শনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁরই ছাত্র। ব্রিটিশ শাসনামলে খ্রিস্টীয় মিশনারীদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষার আলো বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। এদের মধ্যে বাংলা হরফের আধুনিকায়নের জনক উইলিয়াম কেরীও

---

* **মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী** : সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল : batenchowdhury06@gmail.com

কিছুদিন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বরিশালে কাজ করেন। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থেই মূলত শিক্ষা বিস্তারের কাজে তারা ব্রতী হয়েছিলেন। বরিশাল জেলার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্যারেট কর্তৃক ১৮২৮ সালের ৩১ মার্চ বরিশালে প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বরিশাল জিলা স্কুলের গোড়াপত্তন হয় ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর। একই বছর খ্রিস্টীয় মিশনারী জন কেরী বরিশালে আরও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমেই বরিশালে শুরু হয় আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত। সত্য, প্রেম, পবিত্রতার আদর্শ নিয়ে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন কলেজ। শুধু লেখাপড়াই নয়, এই কলেজের ছাত্র–ছাত্রীরা নৈতিকতা এবং দেশপ্রেমেও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। কলেজটির শিক্ষার মান এতটা উন্নত ছিল যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে কলেজটিতে ইংরেজি, দর্শন, সংস্কৃত, গণিত, রসায়ন এবং অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর অনুমতি প্রদান করে। ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক সময়ে বরিশালে রাজচন্দ্র কলেজ নামে আরেকটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারী লাল রায় চৌধুরী পিতা রাজেন্দ্র রায় চৌধুরীর নামে ১৮৮৮ সালে বরিশালে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ সালে উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়টি রাজচন্দ্র কলেজে রূপান্তরিত হয়। দেশের অবহেলিত ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের সন্তানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে ১৯৪০ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে থাকাকালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নের নিভৃত গ্রামীণ পরিবেশে আরও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্থাপিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো কলকাতা মাদ্রাসা। ১৭৮০ সালে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হুগলি মাদ্রাসা ছিল ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত দ্বিতীয় প্রাচীন মাদ্রাসা। বর্তমান পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার ছারছিনা গ্রামে মওলানা নিসার উদ্দিন ১৯১৪ সালে দারুস-সুন্নাত জামেয়া-ই ইসলামিয়া নামে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপন করেন যা শর্ষিনা মাদ্রাসা নামে বেশি পরিচিত। তাঁরই প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে দক্ষিণ বাংলায় অনেকগুলো মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ মুহম্মদ ইসহাক বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের চরমোনাই গ্রামে ১৯৩৪ সালে একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে দেখা যায় যে, প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে বরিশাল জেলা তথা সমগ্র বাংলায় আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার পাশাপাশি বরিশাল জেলায় বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার যে বিস্তার ঘটেছিল সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি মূলত দ্বৈতয়িক উৎসের ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছে। প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় শিক্ষার প্রসার সম্পর্কিত প্রকাশিত বেশ কিছু বই, জার্নাল ও গেজেটিয়ারে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এরকম কয়েকটি বই ও গেজেটিয়ারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে; ডক্টর এম. এ. রহিম-এর *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম-এর *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত-এর *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, ডক্টর ওয়াকিল আহমদ-এর *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* দ্বিতীয় খন্ড, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ-এর *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫*, সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন*, J.C. Jack এর *Bengal District Gazetteers: Bakarganj,* H. Beveridge এর *The District of Bakarganj Its History and Statistics,* Mohammad Mohar Ali এর *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities 1833-1857,* Md. Habibur Rashid সম্পাদিত *Bangladesh District Gazetteers:*

Bakerganj, সুফিয়া আহমেদ-এর *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়*, তপন বাগচী ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম. এ. লতিফ সম্পাদিত *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বাখরগঞ্জ*, সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ -এর *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন সম্পাদিত *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, আনিসুর রহমান স্বপন-এর *বরিশালে শিক্ষা বিস্তার ঃ উনবিংশ শতাব্দী*, হীরালাল দাশগুপ্ত-এর *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস।* তবে উল্লেখিত বই, জার্নাল ও গেজেটিয়ারে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বিশেষ করে বরিশালের যে অগ্রগতি সে সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে বরিশাল তথা বাংলায় শিক্ষা প্রসারের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে উল্লেখিত পুস্তক, জার্নাল ও গেজেটিয়ার ছাড়াও সাময়িকপত্র, প্রতিবেদন, অন্যান্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি উৎসসমূহ হতে যাচাই বাচাই করে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান প্রবন্ধটি লেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রাক-ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় শিক্ষার প্রসার

মুঘল আমল এমনকি প্রাক-মুঘল আমলেও এই অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। মুঘল বিজয়ের পূর্বে স্বাধীন সালতানাতের সময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলায় একটি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাক মুঘল যুগে লক্ষ্মণাবতী (গৌড়), পাণ্ডুয়া, মহিসুন, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, নাগর, মান্দারন, বাঘা, রংপুর ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। তবে মুঘল শাসনামল ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এই সময় বাংলার সুবাদার, দিউয়ান, বকশি, সদর, কাজি, ফৌজদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারী যারা এ প্রদেশে আগমন করেছিলেন তাঁরা সকলেই শিক্ষা ও সুরুচির ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা এবং পন্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খান-ই-খানান মুনিম খান, খান জাহান, রাজা মানসিংহ, ইসলাম খান, কাসিম খান, ইব্রাহিম খান, ফতেহজঙ্গ, শাহজাদা সুজা, মীরজুমালা, শায়েস্তা খান, যুবরাজ মুহম্মদ আজম, আজিম উশশান ও অন্যান্য সুবাদারগণ তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। মুঘল বিজয়ের ফলে ভারতের উত্তরাঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, কারিগর ও তাদের ন্যায় অন্যান্যদের অধিকহারে বাংলায় আগমনের ফলে এখানকার বুদ্ধিদীপ্ত জীবনে এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত হয় (রহিম, ২০১২: ২০৭-২১২)। মুঘল সুবাদারগণের শাসনামলে বিকশিত শিক্ষার চলমান ধারা নবাবদের সময়েও অব্যাহত থাকে।

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল। যথা: প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে কিংবা গৃহে, পথিকের বিশ্রামগৃহে, দোকানের কোনে অথবা গাছের নিচে প্রদান করা হতো। মুসলিম সমাজে প্রতিটি শিশুর চার বছর চার মাস চার দিন হলে তাকে সর্বোত্তম পোশাকে সজ্জিত করে পরিবারের সকল সদস্য ও অন্যান্য স্বজনদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা হতো। ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা শুরু হতো মক্তবে। এসব মক্তব সাধারণত মসজিদ ও ধনী ব্যক্তিদের বাড়ী সংলগ্ন জায়গায় স্থাপিত ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে আরবি, ফার্সী ও বাংলা এই তিনটি ভাষা শিখতে হতো। কোরআন ও হাদিস শিক্ষার জন্য আরবি ভাষা শেখা প্রয়োজন ছিল। আর মুসলিম শাসনামলে ফার্সী ছিল রাজদরবারের ভাষা। তাই রাজ সরকারের অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির জন্য ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন অত্যাবশ্যক ছিল। অন্যদিকে বাংলাভাষা বহু মুসলমান ও

অমুসলমানদের মাতৃভাষা ছিল। ফলে বাঙ্গালি মুসলমানগণ মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে পারেননি। বরং বহিরাগত মুসলমানেরাও বাংলা ভাষা ও এদেশকে নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন (মাসুম, ২০০৮: ১১-১২)। মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের বিদ্যালয়গুলো মাদ্রাসা নামে আখ্যায়িত ছিল। বাংলার প্রধান প্রধান শহর ও অঞ্চলগুলোতে মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। এছাড়াও বাংলার মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করেও বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদ্রাসা আরবি ও ফার্সী এই দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলোতে আরবি ও ফার্সী উভয়ই পড়ানো হতো। মুসলিম আমলে বাংলায় যে অসংখ্য আরবি-ফার্সী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে ওঠেছিল, তৎকালীন বিভিন্ন রিপোর্টে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৮) বাংলায় এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেন। তবে অ্যাডাম বর্ণিত এই এক লক্ষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, অ্যাডামের এই তথ্য অতিরঞ্জিত। আবার কোনো কোনো পন্ডিত এই সংখ্যাকে অমূলক মনে করেননি। যেমন : ১৯২১ সালে জাতীয়তাবদী নেতা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) বাংলায় ১০ লক্ষ মক্তব বা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মওজুদ আছে বলে উল্লেখ করেন (মাসুম, ২০০৮: ১৩)। এ প্রসঙ্গে ড. এম. এ রহিম বলেন যে, অ্যাডাম কর্তৃক উল্লেখিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছিল মুসলমান আমলে স্থাপিত এবং অধিকাংশ পুরনো মক্তব (Rahim, 1967: 245)। হিন্দু শিক্ষার্থীদেরকে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হতো। কখনও কখনও মুসলমানদের মক্তব ও হিন্দুদের পাঠশালা একই ছাদের নিচে বসতো। সকালে মুন্সি (মুসলিম শিক্ষক) এবং অপরাহ্নে পন্ডিত (গুরু) ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন (গুপ্ত, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ: ৩৩০-৩৩৩)। হিন্দু বালিকারাও পাঠশালায় অধ্যয়ন করতো। সপ্তদশ শতকের বাংলা কাব্যগ্রন্থ *'সারদামঙ্গলে'* একটি পাঠশালায় পাঁচজন রাজকন্যার অধ্যয়নের উল্লেখ আছে এবং সেখানে একজন রাজপুত্রসহ বহু বালকও শিক্ষাগ্রহণ করতো। প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি ছয় বছরেরও অধিককাল বিস্তৃত ছিল (সেন, ১৯১৪: ১৩৮৮)। এই থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তখন নারী শিক্ষা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সহ-শিক্ষার প্রচলন ছিল। এই সময় স্থানীয় জমিদার ও ধনী হিন্দুরা পাঠশালা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। *মনসামঙ্গল* কাব্যের কবি বিজয়গুপ্ত বলেন যে, চাঁদ সওদাগর একটি বৃহৎ পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতেন এবং সেখানেই সেমাই পন্ডিত নামক গুরুর নিকট তাঁর ছয়পুত্র শিক্ষাগ্রহণ করে (রহিম, ২০০৮: ১৫১)। প্রথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর হিন্দু বালকগণ উচ্চশিক্ষার জন্যে টোলে প্রবেশ করতো। কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্রদেরকেই টোলে শিক্ষা দেয়া হতো। তবে অর্থ ও প্রতিপত্তির সাহায্যে ধনী বণিকগণও তাদের সন্তানদেরকে টোলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতেন। টোলের গুরু সাধারণত রাষ্ট্র প্রদত্ত নিষ্কর জমির আয় থেকে নিজের ভরণ-পোষণ করতেন। তিনি ছাত্রদের নিকট থেকে কোনো রকম বেতন গ্রহণ করতেন না। কিন্তু শিক্ষার্থীরা গুরুর সংসার কার্যে সাহায্য করতো এবং তাদের শিক্ষাজীবন শেষে নানা ধরনের উপঢৌকন বা গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করতো (Datta, 1963 : 237; সেন, ১৯৪৮: ১১৩)। মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার কয়েকটি কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে নবদ্বীপের কেন্দ্রটি ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও সাঁতগাঁও, ফুল্লশ্রী (বরিশাল), সিলেট, চট্টগ্রাম, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল (মাসুম, ২০০৮: ১৬)। বরিশাল জেলার কবি বিজয়গুপ্তের বসতগ্রাম ফুল্লশ্রী ষোড়শ শতকে হিন্দু শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। বিজয়গুপ্ত তার *পদ্মপুরাণে* বলেন, ফুল্লশ্রীতে ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল; তাঁরা চার বেদ ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। কায়স্থগণ লেখার কাজে দক্ষ ছিল এবং অন্যান্য লোকেরা তাদের নিজ নিজ পেশায় চতুর ছিল (রহিম, ২০০৮: ১৫২)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রথমে বালি ও ধুলার উপর লেখার অভ্যাস করতো। এরপর তারা মেঝেতে খড়িমাটি দিয়ে লেখার চেষ্টা করতো। পরবর্তী পর্যায়ে তারা তালপাতা, কলাপাতা ও ভোজপাতায় লিখতো। খড়ের বা নলখাগড়ার টুকরা, বাঁশের কঞ্চি, পাখি, ময়ূর ও হাঁসের পালক ইত্যাদি কলমরূপে ব্যবহৃত হতো। শ্লেট, পেনসিল ও ব্ল্যাকবোর্ড

তখন অজ্ঞাত ছিল। ছাত্ররা মেঝেতে অথবা তাদের নিজেদের আনা মাদুরের উপর বসতো (রহিম, ২০০৮: ১৫৪)।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় শিক্ষার প্রসার

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোন স্পষ্ট শিক্ষানীতি গ্রহণ করেনি। প্রথমদিকে বরং উদাসীন ছিলেন এই ভেবে যে, শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করলে জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। এদেশে মক্তব-মাদ্রাসা ও টোলসমূহে শিক্ষা ছিল প্রাচীন ও ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক। ১৭৯২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য উইলিয়াম উইলবারফোর্স ভারতে শিক্ষা ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করলে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস-এর একজন সদস্য বলেন যে, ইংল্যান্ড তাদের ভুলের জন্যই আমেরিকা হারিয়েছিল। তাদের ভুল ছিল, সেখানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ভারত প্রসঙ্গেও যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে (আহমদ, ১৯৮৩: ১০৩-১০৪)। সুতরাং একথা বলা যায় যে, ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ক্রিয়াশীল ছিল। এতদসত্ত্বেও ইউরোপীয় মিশনারী, স্থানীয় নব্যশিক্ষিত বাঙালি ও কোম্পানীর কিছু প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখেন। তবে জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় আরম্ভ হয়। ১৭১৯ সালে The society for Promoting Christian knowledge নামে একটি সমিতি কলকাতায় আগমন করে। এই সমিতির উদ্যোগে ১৭৩১ সালে কলকাতায় একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলায় এটিই ছিল পাশ্চাত্য জাতীয় প্রথম বিদ্যালয়। অতঃপর ১৭৫৮ সালে Zacharich kierchander নামে সুইডেনের এক ধর্মযাজক কলকাতায় একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৮ জন ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, যাদের মধ্যে ছয় জন ছাত্র ছিল বাঙালি (মাসুম, ২০০৮: ২৬)।

কলকাতার মুসলমানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮২ সালে মাদ্রাসাটিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা হয়। ১৭৯২ সালে বেনারসের রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বেনারস সংস্কৃত কলেজ। কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষাদান চরিত্র ছিল প্রধানত ধর্মীয়। এতদসত্ত্বেও এই দু'টি প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল মুসলমান ও হিন্দু যুবক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতো তারা কোম্পানীর জন্য সহায়ক ছিল (আহ্মদ, ২০০০: ১২৫)। প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার জন্য ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। কোম্পানীর তরুণ সিভিল সার্ভেন্টদের ভারতীয় আইন ও ভাষাসমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতে শিক্ষা বিস্তারে এটি বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল (আহ্মদ, ২০০০: ১২৫-১২৬)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরবর্তীকালে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য চার্লস গ্রান্ট ও উইলিয়াম কেরি ১৭৯৩ সালে 'ব্যাপ্টিস্ট মিশন সেসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের প্রচেষ্টায় উইলিয়াম কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীগণ ১৮০০ সালে 'শ্রীরামপুর মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন (Ali, 1965: 2)। উইলিয়াম কেরি এই সময় মিশনে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'সমাচার দর্পণ' নামে বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন ছিল বলে মিশনারীরা স্বাধীনভাবে শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার কার্য পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

চার্লস গ্রান্ট ও উইলবারফোর্সের মতো শিক্ষাবিদ মিশনারীদের দাবীর মুখে শেষ পর্যন্ত ১৮১৩ সালে ২০ বছর মেয়াদি সনদ লাভের সময় কোম্পানী ভারতীয়দের শিক্ষাদানের জন্য সর্বপ্রথম বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন পায় এবং কর্তৃপক্ষ কোম্পানীকে মিশনারীদের কার্যক্রমে উৎসাহিত

করার নির্দেশ প্রদান করে (আহমদ, ১৯৮৩: ১০৪)। ১৮১৩ সালের পর খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৮১৮ সালের মধ্যেই খ্রিস্টান মিশনারীদের নানা সংগঠন কর্তৃক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ঐ সব বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩,৩৪৭ জন (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৪: ৫১-৫২)। পরবর্তীকালে ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর সনদ নবায়নের সময় গণশিক্ষা কমিটির অনুদান এক লক্ষ টাকা থেকে দশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে বাংলা তথা ভারতে শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়ের নির্দেশ দেয়। ১৮৩৫ সালে ফার্সীর পরিবর্তে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালুর পাশাপাশি ১৮৩৭ সালে আইন আদালতেও ইংরেজির প্রবর্তন এবং সেই সাথে ১৮৪৪ সালে চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হয় (আহমেদ, ২০০২: ৪-৫)। এসব সিদ্ধান্তের ফলে ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বহু মুসলমান শিক্ষক, মৌলভী, মুনশি ও কাজী তাদের জীবিকা হারান এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন। এর কারণ ছিল দু'টি: একদিকে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা যেমন ছিল, তেমনি মুসলমানদের নিকট ধর্মীয় ভাষা আরবী অথবা উচ্চ সমাজের ফার্সী ত্যাগের অর্থ-ই ছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে হারানো। মুসলমান সমাজের এই পরিবর্তনকে দ্রুত গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে ফিলিপ হারটগ মনে করেন, "... a real though Unfounded fear that it would lead to Christian proselytization on a large scale" (আহমেদ, ২০০২: ৪-৫)। এরপরও ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা তাদের শাসনকার্যের সুবিধার্থে আরও ঢেলে সাজাতে তৎপর হয় এবং এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: ১৮২৩ সালের General committee of public Instruction গঠন, ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রতিবেদন, ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে উইলিয়াম অ্যাডামসের শিক্ষা রিপোর্ট, ১৮৫৪ সালের চার্লস উডের শিক্ষা ডেচপ্যাচ প্রণয়ন, ১৯১৪ সালের নাথান রিপোর্ট, ১৯১৭ সালের স্যাডলার কমিশন প্রভৃতি। এসব পদক্ষেপের ফলে বাংলায় আধুনিক স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয় এবং শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া হয় (লতিফ, ২০০৬: ৫১৪)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে উদ্দেশ্যই হোক না কেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের ও ধারার শিক্ষা কাঠামোর প্রচলন ব্রিটিশ আমলেই সূচিত হয়। এবার ব্রিটিশ শাসনাামলে বরিশাল জেলার শিক্ষার সার্বিক চিত্র দেখা যাক।

ব্রিটিশ শাসনামলে বরিশাল জেলায় শিক্ষার প্রসার

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকগণ প্রথম দিকে এ দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টীয় মিশনারীদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষার আলো বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থেই মূলত এই কাজে তারা ব্রতী হয়েছিলেন। তবে শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণও সীমিত পর্যায়ে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বরিশাল জেলায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডব্লিউ. এন. গ্যারেট। তিনি ১৮২৮ সালের ৩১ মার্চ সর্বপ্রথম বরিশাল শহরে একটি আধুনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (Jack, 1918: 114)। ২৭ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করা বিদ্যালয়টি বরিশালের প্রথম নিয়মিত ইংরেজি স্কুল ছিল। ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর সরকারি অনুমোদন পেয়ে স্কুলটি বরিশাল স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৮৫৩ সালে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় বরিশাল জিলা স্কুল। ১৮২৯ সালের শ্রীরামপুর মিশনারীগণ কর্তৃক বরিশালে আরও একটি মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় (Beveridge, 1876: 317)। এর মাধ্যমে বরিশালে শুরু হয় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে ঝালকাঠি জেলার বাসন্ডা গ্রামে ও প্রতিটি মহকুমা সদরে একটি করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বাংলা হরফের আধুনিকায়নের জনক উইলিয়াম কেরীও কিছুদিন ধর্ম প্রচারের উদেশ্যে বরিশালে কাজ করেন। সে সময়ে এতদাঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মান্ধতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি চরম ঘৃণা ও ঔদাসিন্যের কারণে ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের নীতি আঁকড়ে থাকে এবং শিক্ষা–দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বহুকালধরে পিছিয়ে থাকে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বরিশালে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বেশ প্রসার ঘটে। এই জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং প্রথম এম. এ ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। ১৯০০ সালে বরিশাল জেলায় সর্বমোট গ্র্যাজুয়েট ছিলেন ২০০ জন। এর মধ্যে মুসলিম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন মাত্র সাতজন। তারা হলেন: মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, সৈয়দ মোতাহার হোসেন, আসগর আলী, এম. লুৎফর রহমান এবং আফসার উদ্দিন মিয়া।

প্রাথমিক শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে বরিশাল জেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে অপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এবং মিশনারীরা সম্মিলিতভাবে বরিশালের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে ১৮৫৬ সালে জেলার একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ২৬ জন ছাত্র অধ্যয়ন করতো সেখানে ১৮৭০ সালে ৩৫টি বিদ্যালয়ে ১,৫০০ জন ছাত্র এবং ১৮৭৪ সালে ২৩৫টি বিদ্যালয়ে ৬,৬৭৮ জন ছাত্র অধ্যয়ন করতো। ১৮৯২ সালে এই জেলায় ১২৭টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪,৫৯৭ জন ছাত্র এবং ২০,৭২৭টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০,১১১ জন ছাত্র অধ্যয়ন করতো। ১৯১০ সালে বরিশালে উচ্চতর প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩৯টি এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১১,৮৪৫ জনে। ১৮৫৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে বরিশাল জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৩৮ গুণ এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৪৪০.৭৩ গুণ। কিন্তু এই সময়ে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে হয় ২,৬২৩টি, তবে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৭,৪৬৮ জনে (Rashid, 1981: 225-226)।

মাধ্যমিক শিক্ষা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতি ছিল দু'ধরনের। মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষা মানের মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। এছাড়া একই মানের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ছিল দেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Vernacular middle class school)। ১৮৭৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বরিশাল জেলায় ২টি উচ্চ ইংরেজি স্কুল, ১৮টি মধ্য ইংরেজি স্কুল, ৩৭টি মধ্য ভার্ণাকুলার স্কুল এবং ৩০৪টি নিম্ন ভার্ণাকুলার স্কুল ছিল। এসব স্কুলের মধ্যে ২টি উচ্চ ইংরেজি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩৭ জন, তন্মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিল ২৬ জন। ১৮টি মধ্য ইংরেজি স্কুলে ৮৬ জন মুসলিম ছাত্রসহ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৩০৪ জন এবং ৩৭টি মধ্য ভার্ণাকুলার স্কুলে মোট ছাত্র ছিল ১,৭৩৭ জন, যার মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিল ২১১ জন। এছাড়াও ৩০৪টি নিম্ন ভার্ণাকুলার স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮,৫৩০ জন এবং তন্মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিল ৪,২৬৯ জন (Jack, 1918: 114)। ১৮৭৪ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে বরিশাল জেলায় মাধ্যমিক ভার্ণাকুলার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৩২ গুণ এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৯৮ গুণ। ১৮৯২ সালে এই জেলায় মধ্য ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৮টি এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ২,৬৯৮ জন। ১৯১০ সালে এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৩টি ও ছাত্র সংখ্যা হয় ৪৪৩৮ জন। এসব বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সদর মহাকুমার ৩৪টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৩৪৮৭ জন, পিরোজপুর মহকুমার ৩১টি বিদ্যালয়ে ৩,৩০৫ জন, শাহবাজপুর মহাকুমার ৯টি বিদ্যালয়ে ৯১১ জন এবং পটুয়াখালী মহাকুমার ৫টি বিদ্যালয়ে ৪৫৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন

করতো (Jack, 1918: 118)। এছাড়া ১৮৯২ সালে জেলায় মাধ্যমিক ভার্ণাকুলার স্কুলের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় ৪৬টি এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ২,১৭১ জন। কিন্তু ১৯১০ সালে এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে হয় ৩১টি এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ১,৬৬৯ জন (লতিফ, ১৯৮৪: ১৯৩)।

উনিশ শতকে বরিশাল জেলায় সাধারণ কৃষক সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রগতি ছিল প্রশংসনীয়। ১৮৭০ সালে বিদ্যালয় পরিদর্শক বরিশাল জেলার শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, বাংলায় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা, বৃত্তিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয় ও ভার্ণাকুলার বিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রে বরিশাল অঞ্চল অগ্রগামী। এমনকি চিকিৎসা পেশায়ও এই জেলার অংশগ্রহণ সন্তোষজনক (Jack, 1918: 115)। ১৯০১ সালে বরিশাল জেলায় ১৬টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও ৪০টি ভার্ণাকুলার স্কুল ছিল। এসব স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,৫৫৭ জন এবং ১,৯৯৮ জন। ১৯১১ সালে জেলায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯টি (Jack, 1918: 117-118)। ছাত্রসংখ্যাসহ এই ১৯টি বিদ্যালয় হলো: বরিশাল জিলা স্কুল (৫৭৪), বি এম ইনস্টিটিউট (৮৬৬), ঝালকাঠি স্কুল (৩৬৮), কীর্তিপাশা স্কুল (৫১৩), গাভা স্কুল (৩৯৪), উজিরপুর স্কুল (৪৭৫), গৈলা স্কুল (৭৬৮), লক্ষণকাঠী স্কুল (৪৭৫), নলচিড়া স্কুল (২৭৭), রহমতপুর স্কুল (৩৪৮), সিদ্দকাঠি স্কুল (৩৪৭), কলসকাঠি স্কুল (২৯৫), উত্তর শাহবাজপুর স্কুল (৩৫০), উলানিয়া স্কুল (১৭৪); পিরোজপুর মহাকুমার পিরোজপুর স্কুল (৫০১), বাইশারী স্কুল (৫১২), বানারীপাড়া স্কুল (৩৩৮), কদমতলা স্কুল (৩১১), পটুয়াখালী স্কুল (৪৮৩) এবং ভোলা স্কুল (৫০৫)। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বরিশাল জেলায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৭৫ গুণ এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৯৪.৭৩ গুণ। ১৯২০ সালে জেলায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল ৪৮টি এবং ১৯৩০ সালে এই সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৮৪টি। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় বরিশাল জেলায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২০টি (আহ্‌মেদ, ২০১০: ৬৯৬)। এই জেলায় ব্যক্তিগত ও সমস্টিগত উদ্যোগে এসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার কয়েকটি জমিদার পরিবার শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখে। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহমেদ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, ভেগাই হালদার, নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত, নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য, শরৎ গুহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কলেজ শিক্ষা

ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত বরিশাল জেলায় মাত্র তিনটি কলেজ ছিল। এর মধ্যে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৯৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককালে বরিশাল শহরে রাজচন্দ্র কলেজ নামে আরেকটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লাখুটিয়ার জমিদার বিহারী লাল রায় চৌধুরী পিতা রাজেন্দ্র রায় চৌধুরীর নামে প্রথমে ১৮৮৮ সালে বরিশালে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে উচ্চ বিদ্যালয়টি রাজচন্দ্র কলেজে রূপান্তরিত হয় (লতিফ, ১৯৮৪: ১৯৪)। বরিশাল জেলার তৃতীয় কলেজটি ১৯৪০ সালে বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে ২৭ নভেম্বর বাংলার গভর্ণর জন হার্বার্ট চাখার কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন (আহ্‌মেদ, ২০১০: ৬৯৫)। এছাড়াও বরিশাল জেলার গৈলায় একটি সংস্কৃত কলেজ ছিল যা ১৮৯৬ সালে কবিন্দ্র কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয় (উদ্দিন, ১৯৯০: ৯৬০)। এই কলেজটি বেশি দিন স্থায়ী না হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে চতুর্দিকে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় সুখ্যাতির কারণে দুর্গম যাতায়াত ও নানা সামাজিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ত্রিলোচন দাস সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিক্রমপুর থেকে গৈলায় এসেছিলেন। কবি বিজয়গুপ্ত গৈলাকে বর্ণনা করেছেন পন্ডিত নগরী হিসেবে। পুরাতন ভাবধারার ধর্ম, সংস্কৃত চর্চা,

টোল, মক্তব প্রভৃতিতে যেমন তৎকালে অবিভক্ত বাংলায় গৈলা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, ঠিক আধুনিক যুগেও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে গৈলা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। তবে উপমহাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির সংঙ্গে গৈলার প্রথম সংযোগ ঘটে 'কবিন্দ্র' উপাধি প্রাপ্ত 'কলাপ ব্যাকরণের কাতন্দ্র পরিশিষ্ট' নামক টীকার রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্তের মামা ত্রিলোচন দাসের মাধ্যমে (উদ্দিন, ১৯৯০: ৯৪৫-৯৬৬)।

কারিগরি ও প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বরিশাল জেলায় কয়েকটি কারিগরি ও প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো: ১টি টেকনিক্যাল স্কুল যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫১ জন ও ১টি কমার্শিয়াল স্কুল যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬ জন। টেকনিক্যাল স্কুলগুলো সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হলেও কমার্শিয়াল স্কুলটি ছিল শুধুপ্রাপ্ত সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এ সময় সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিক্ষণ শিক্ষালয়ের সংখ্যা ছিল ৪টি এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭২ জন। এছাড়া একই সময়ে ৬৭০ জন ছাত্রসহ বিভিন্ন ধরনের ২৪টি সরকারি শিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত শিক্ষার টোল। এ সময় বরিশাল জেলায় শুধুমাত্র কোরান শিক্ষার জন্য ২৯টি শিক্ষণ স্কুল চালু ছিল যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৬৫ জন (Jack, 1918: 119)।

নারী শিক্ষা

১৮১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি-ই ছিল ভারতবর্ষের নারী শিক্ষার প্রথম আধুনিক প্রতিষ্ঠান। ১৮২০ সালে সারা দেশে ৬০টি স্ত্রী পাঠশালা ছিল। ১৮২৩ সালে ৩২টি বালিকা বিদ্যালয়ে ৪৮০ জন ছাত্রী এবং ১৮৬৮ সালের মধ্যে ৩৫টি নিয়মিত বিদ্যালয়ে প্রায় ১,৩০০ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করতো (স্বপন, ১৯৮৫: ছিয়াত্তর)। কিন্তু বরিশালে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে আরও বিলম্ব হয়। ১৮৭৩ সালে সর্বপ্রথম বরিশালে নারী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় (Jack, 1918: 14)। সেসময় প্রথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে একই সাথে পড়াশুনা করতো। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বরিশালে ৬টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ৩টি বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৫ জন এবং বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ৩টি বালিকা বিদ্যালয়ে ৪৫ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করতো (Jack, 1918: 120)। এই ৮০ জন বালিকার সবাই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এই সময় একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ছিল যে, রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধতার কারণে মুসলিম নারীরা ইংরেজ প্রবর্তিত নারীশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করলেও হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও নারী শিক্ষায় খুব একটা অগ্রসর ছিল না। H. Beveridge মনে করেন, হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি বাল্য বিবাহও এই জেলায় নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায় ছিল। এছাড়া অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাও শিক্ষার অগ্রগতিতে অন্যতম বাধা ছিল। তবে বিদ্যাচর্চার চেয়ে এই জেলার অধিবাসীরা নিজেদের পেশা ও ঐতিহ্যকে বংশ পরম্পরায় আঁকড়ে থাকতো। এই জন্য H. Beveridge মন্তব্য করেন, ''The peasants do not care education; and besides, they need their children to gather their betel-nuts, to Roy their boats, and above all to heart their cattle" (Beveridge, 1876: 318)। নারী শিক্ষার জন্য ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে বরিশালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ না থাকায় অল্পকালের মধ্যে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তিতে ১৮৭১ সালে ব্রাহ্মসভার সহযোগিতায় একটি নারীকল্যাণ সভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সভার উদ্যোগে মেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। এই নারীকল্যাণ সভাটিই ১৮৭৭ সালে "বাকেরগঞ্জ হিতৈষণী" সভাতে পরিণত হয় (দাশগুপ্ত, ১৯৯৭: ২২)। ফরিদপুরের অম্বিকাচারণ মজুমদার, উজিরপুরের বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, গাভার অমৃতচন্দ্র ঘোষ, অভয়নীলের হরনাথ ঘোষ, ইলুহারের বিহারী লাল এবং

নরোত্তমপুরের উগ্রকণ্ঠ হিতৈষণী সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২২জন। বাখেরগঞ্জ হিতৈষণী সভার সদস্য সিদ্ধকাঠির গিরিজাপ্রসন্ন রায় প্রণীত 'গৃহলক্ষ্মী' এবং গৈলার আনন্দচন্দ্র সেন প্রণীত 'গৃহিণীর কর্তব্য' স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায়ক ভূমিকা পালন করে (রায়, ১৮৯৫: ৩২৬-৩২৭)। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে শান্তি সুধা ঘোষ, অপরাজিতা ঘোষ, মনিকুলা সেন, ফুলরেনু গুহ, নীহারবালা গুহঠাকুরতা, উষা রায় প্রমুখ উচ্চশিক্ষা লাভ করে সমসাময়িক মেয়েদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করেন। তবে শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা উভয় ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েদের তুলনায় মুসলমান মেয়েরা অনেক পিছিয়ে ছিল। স্বদেশি আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু মেয়েরা অংশগ্রহণ করলেও মুসলিম মেয়েরা অংশগ্রহণ করেনি। মুসলিম মেয়েদের সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে ১৯৩৬ সালে বরিশাল টাউন হলে মিসেস ফজলে রাব্বীর সভাপতিত্বে একটি মুসলিম মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে হালিমা খাতুনকে সভানেত্রী এবং খান বাহাদুর হাশেম আলী খানের কন্যা লুৎফুন নেসাকে সম্পাদক করে একটি মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করা হয়। ১৯৩৭ সালে বরিশাল জেলায় মুসলিম মেয়েদের মধ্যে প্রথম ডিগ্রী পাস করেন মেহেরুন নেসা। ১৯৪১ সালে বরিশাল জেলায় হিন্দুদের শিক্ষার হার ছিল ২৮.৩ শতাংশ এবং মুসলমানদের শিক্ষার হার ছিল ১৫.১ শতাংশ। ১৯৪৬ সালে ব্রজমোহন কলেজে ২,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল মাত্র ৪ জন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই জেলায় মেট্রিক পাস করেছে এমন নারীর সংখ্যা ৩০ এর অধিক ছিলনা (আহ্মেদ, ২০১০: ৬৯৭)। সুতরাং একথা বলা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত বরিশাল জেলার নারীরা শিক্ষা গ্রহণে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।

মাদ্রাসা শিক্ষা

ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটে মুসলিম শাসনামলে। এতদাঞ্চলের মুসলিম শাসক, সুফি, উলেমা, জমিদার ও বিত্তশালীদের সম্পৃক্ততায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক মক্তব-মাদ্রাসার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সকল মক্তব-মাদ্রাসা সাধারণত মসজিদের পাশেই গড়ে উঠতো, কখনওবা মাদ্রসার ভিতরেও মসজিদ নির্মাণ করা হতো (করিম, ১৯৯৩: ৮১)। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের বাংলা প্রদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, সমগ্র দেশে এমন কোনে মসজিদ ছিলনা যাকে কেন্দ্র করে কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। এই সকল মক্তব-মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য মুসলিম শাসক ও জমিদাররা করমুক্ত ভূমিদান করতো। ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্থাপিত প্রথম শিক্ষপ্রতিষ্ঠান হলো কলকাতা মাদ্রাসা। ১৭৮০ সালে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হুগলি মাদ্রাসা ছিল ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত দ্বিতীয় প্রাচীন মাদ্রাসা (মাসুম, ২০০৮: ৪২৮)। এরপর বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯১১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ও আসামে মোট ১৬১টি স্বীকৃত মাদ্রাসা ছিল যার মধ্যে সরকারি ৩টি, সাহায্যপ্রাপ্ত ১১৩টি ও কোন ধরণের সাহায্য ছাড়া ৪৫টি পরিচালিত হতো। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সভা-সমিতির উদ্যোগে বাংলায় আরও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল মাদ্রাসার মধ্যে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মাধ্যমে বাংলার পার্বতীপুর, বগুড়া, রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, গাইবান্ধা ও বাকেরগঞ্জে ৮টি জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা আকরম খাঁ, মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, মৌলানা আব্দুল্লাহেল বাকী প্রমুখ তরুণ আলেমগণের নেতৃত্বে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সমিতির নের্তৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার নানা স্থানে এর শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত

হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। যেমন, ফরিদপুরের খানখানাপুরের শাখার অধীনে ২টি পাঠশালা, নোয়াখালী জেলার আহমদপুর শাখার তত্ত্বাবধানে ১টি মক্তব, বরিশাল হেতালিয়া শাখার অধীনে ১টি মক্তব পরিচালিত হতো। এছাড়াও পশ্চিম বাংলার বীরভূমে রামপুরহাট শাখা সমিতি দ্বারা ১টি মক্তব, নদীয়া জেলার ভেড়ামাড়ায় ১টি পাঠশালা পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং একথা বলা যায় বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষাবিস্তারে এই সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (মাসুম, ২০০৮: ১৬১। এসব মাদ্রাসায় নিজস্ব ব্যবস্থায় আরবী শিক্ষাকে প্রধান্য দেয়া হলেও বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও পাঠদান করা হতো। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় মোট মাদ্রাসা ছিল ২৮১টি। তন্মধ্যে ৫টি সরকারি, ১৮২টি সাহায্যকৃত ও ৯৪টি ছিল বেসরকারি। মাত্র দশ বছরের মধ্যে ১৯২৭ সালে এসে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৫৮টি; যার মধ্যে ৬টি সরকারি, ১৬২টি বেসরকারি এবং ৩৭০টি ছিল সাহায্যকৃত। ১৯১৭ সালে যেখানে বাংলার মাদ্রসাসমূহের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০,৪৩৫ জন সেখানে ১৯২৭ সালে এই সংখ্যা ৫০,৯৯৯ জনে উন্নীত হয়। আর ১৯৩১ সালে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪৬টিতে এবং এতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৯,৮২৪ জন। অতঃপর ১৯৪২ সালে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে হয় ৯৩৩টি এবং এতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০২,৭৪৯ জন। অতএব একথা বলা যায় যে, ১৯১৭ সালের তুলনায় বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় চারগুণ এবং একই সাথে শিক্ষার্থী সংখ্যাও বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। এভাবে ক্রমান্বয়ে বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারিত হতে থাকে।

১৯১৪ সালে বরিশাল জেলার ছারছিনায় প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। মওলানা নিসার উদ্দিন মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন (সাকলায়েন, ১৯৯৩ : ২০৪; হোসাইন, ২০১৩ : ১৬২-১৬৯; বান্না, ১৯৯৪: ২৩০-২৩৪)। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী নেয়ার পর তিনি ছারছিনায় দারুস-সুন্নত জামেয়া-ই ইসলামিয়া নামে মাদ্রাসাটির গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে মাদ্রাসাটি আলীয়া মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে মাদ্রাসাটির ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দু'শত জন। তিনি ছারছীনায় মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য বইয়ের এক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে দক্ষিণ বাংলায় অনেকগুলো মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে সৈয়দ মুহম্মদ ইসহাক বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের চরমোনাই গ্রামে একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন (রহমান, ২০১০: ১১২; বান্না, ১৯৯৪: ২৩৪)। এই মাদ্রাসায় আলীয়া ও কওমী দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকও রচনা করেন।

উপসংহার

বরিশাল জেলায় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা শুরুর পূর্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য টোল এবং আরবি, ফারসি ও কোরান শিক্ষার জন্য মক্তব চালু ছিল। মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের বিদ্যালয়গুলো মাদ্রাসা নামে আখ্যায়িত ছিল। বাংলার প্রধান প্রধান শহর ও অঞ্চলগুলোতে মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। এছাড়াও বাংলার মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করেও বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদ্রাসা আরবি ও ফারসি এই দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলোতে আরবি ও ফারসি উভয়ই পড়ানো হতো। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোন স্পষ্ট শিক্ষানীতি গ্রহণ করেনি। এতদসত্ত্বেও ইউরোপীয় মিশনারী, স্থানীয় নবশিক্ষিত বাঙালি ও কোম্পানীর কিছু প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখেন। তবে জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণ সীমিত পর্যায়ে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খাল, বিল ও নদী বেষ্টিত যোগাযোগ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতার কারণে বরিশালের সব অঞ্চলে সমানভাবে শিক্ষার অগ্রগতি না ঘটলেও জেলায় আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ

করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকগণই। এক্ষেত্রে বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডব্লিউ. এন. গ্যারেট এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮২৮ সালের ৩১ মার্চ সর্বপ্রথম বরিশাল শহরে একটি আধুনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর বরিশাল জিলা স্কুলের গোড়া পত্তন হয় ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর। একই বছর খ্রিস্টীয় মিশনারী জন কেরী বরিশালে আরও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমেই বরিশালে শুরু হয় আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৮৪ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন। মাত্র পাঁচ বছর পর ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন কলেজ। একই সময়ে লাখুটিয়ার জমিদার বিহারী লাল রায় চৌধুরী পিতা রাজেন্দ্র রায় চৌধুরীর নামে প্রথমে ১৮৮৮ সালে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরের বছরই ১৮৮৯ সালে উচ্চ বিদ্যালয়টি রাজচন্দ্র কলেজে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে বরিশাল জেলায় তৃতীয় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ সালে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে চাখারে কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে ২৭ নভেম্বর বাংলার গর্ভণর জন হার্বার্ট চাখার কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

১৮৭৩ সালে সর্বপ্রথম বরিশালে নারী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। সেসময় প্রথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে একই সাথে স্কুলে পড়াশুনা করতো। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বরিশালে ৬টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। তবে প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে বরিশাল জেলার নারীরা শিক্ষা গ্রহণে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি, যদিও বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে শান্তি সুধা ঘোষ, অপরাজিতা ঘোষ, মনিকুলা সেন, ফুলরেনু গুহ, নীহারবালা গুহঠাকুরতা, উষা রায় প্রমুখ উচ্চশিক্ষা লাভ করে সমসাময়িক মেয়েদের মধ্যে কিছুটা প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন। ১৭৮০ সালে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হলেও বরিশাল জেলার ছারছিনায় ১৯১৪ সালে দারুস-সুন্নত জামেয়া-ই ইসলামিয়া নামে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এছাড়া ১৯৩৪ সালে সৈয়দ মুহম্মদ ইসহাক বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের চরমোনাই গ্রামে আরও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার পাশাপাশি বরিশাল জেলায় বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে।

তথ্যসূত্র

আহমদ, ডক্টর ওয়াকিল (১৯৮৩) *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* (দ্বিতীয় খন্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আহ্‌মদ, সালাহ্‌উদ্দীন (২০০০) *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫* সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ, বেলাল চৌধুরী ও সুব্রত বড়ুয়া অনূদিত। ঢাকা: আইসিবিএস।

আহমেদ, সুফিয়া (২০০২) *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ অনূদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আহ্‌মেদ, সিরাজ উদ্‌দীন (২০১০) *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস* (প্রথম খন্ড) (চতুর্থ সংস্করণ)। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

উদ্দিন, মোহাম্মদ সাইফ (সম্পাদিত) (১৯৯০) *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*। ঢাকা: আঞ্চলিক ইতিহাস ফাউন্ডেশন।

করিম, ড. আবদুল (১৯৯৩) *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

গুপ্ত, যোগেন্দ্র নাথ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) *বিক্রমপুরের ইতিহাস*। কলিকাতা: ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল কুমার (১৯৭৪) *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন*। কলিকাতাঃ রত্না প্রকাশন।

দাশগুপ্ত, হীরালাল (১৯৯৭) *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল* (দ্বিতীয় সংস্করণ)। কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ।

বান্না, আজিজুল হক (১৯৯৪) *বরিশালে ইসলাম*। ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

মাসুম, মোঃ আব্দুল্লাহ আল (২০০৮) *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

রহমান, আতিয়ার (২০১০) *দক্ষিণ বাংলার অভিজাত শ্রেণী*। ঢাকাঃ কথা প্রকাশ, ২০১০।

রহিম, ডক্টর এম. এ. (২০০৮) *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (*প্রথম খন্ড) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত (দ্বিতীয় মুদ্রণ)। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

রহিম, ডক্টর এম. এ. (২০১২) *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (দ্বিতীয় খন্ড) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ)। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

রায়, খোসালচন্দ্র (১৮৯৫) *বাকরগঞ্জের ইতিহাস*। বরিশালঃ আদর্শ প্রেস। তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাশার (সম্পাদিত) (২০১২) *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, দ্বিতীয় প্রকাশ। ঢাকাঃ আনন্দধারা।

লতিফ, আবু হামিদ (২০০৬) বিশ শতকের বাংলাদেশে শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ। তপন বাগচী ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর। ঢাকাঃ সূচীপত্র, পৃ. ৫১৪।

লতিফ, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম. এ. (সম্পাদিত) (১৯৮৪) *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বাখরগঞ্জ*। ঢাকাঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্বপন, আনিসুর রহমান (১৯৮৫) বরিশালে শিক্ষা বিস্তারঃ উনবিংশ শতাব্দী। *স্মরণিকা গ্রন্থমেলা'৮৫*, পৃ. ছিয়াত্তর।

সাকলায়েন, গোলাম (১৯৯৩) *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*। ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (১৯১৪) *বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়* (দ্বিতীয় খন্ড)। কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেন, সুকুমার (১৯৪৮) *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খন্ড)। কলকাতাঃ ইসটার্ন পাবলিশার্স।

হোসাইন, মোঃ মোয়াজ্জেম (২০১৩) বরিশালে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে পীর-আউলিয়া ও ওলামা-মাশায়েখের ভূমিকা। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৩ পৃ. ১৬২-১৬৯।

Ali, Mohammad Mohar (1965) *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities 1833-1857*. Chittagong: The Mehrab Publication.

Beveridge, H. (1876) *The District of Bakarganj Its History and Statistics*. London: Trubner & Co.. Reprint (1970). Barisal: Bakerganj District Council.

Datta, Kali kinkar (1963) *Alivardi and his times.* Calcutta: The World Press Private Ltd..

Jack, J.C. (1918) *Bengal District Gazetteers: Bakarganj*. Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot..

Rahim, M. A. (1967) *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. 11. Karachi: Pakistan Publishing House.

Rashid, Md. Habibur (ed.) (1981) *Bangladesh District Gazetteers: Bakerganj*. Dacca: Bangladesh Government Press.

[**Abstract:** Structured education system was introduced in Bengal during the British rule. But even during the pre-British period education and cultures were developed in this territory. Due to the communication system surrounded by rivers, education did not extent everywhere in Barishal in the same way as in other parts of Bengal. But since ancient times, in some areas of Barishal, there has been such a wonderful progress in education, the examples of which are rare. In undivided Bengal, Goila of Barishal was especially famous in religion, practice of culture, toll and maktab etc., Goila also showed achievements take-in English education during the British rule. Apart from Goila, Gava of Banaripara, Khalishakota, Dahergati of Babuganj, Nalchira of Gouranadi, Batajor, Chandshi, Uzirpur, Sholak and Dhamura areas of Barishal were also very advanced in education. The insights of this article are to explore on the expansion of education in Barishal and Bengal during the pre-British and British rule.]